#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

27th April to 02nd May 2026

RICE IAS

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01

1.1.1. দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংকট: দশম তফসিলের পুনর্মূল্যায়ন 01

1.1.2. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম 05

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 08

1.2.1. ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ 08

1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার 12

1.3.1. সুরক্ষা থেকে সেবা: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের পথ 12

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **17**

2.1. অর্থনীতি 17

2.1.1. চরম তাপপ্রবাহ এবং গিগ ইকোনমি: ভারতের নগর শ্রম সহনশীলতার পুনর্ভাবনা 17

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংকট: দশম তফসিলের পুনর্মূল্যায়ন

ভূমিকা

- সম্প্রতি **রাজ্যসভায়** একটি রাজনৈতিক দলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধির অন্য দলে যোগদানের ঘটনা **দশম তফসিলের** কার্যকারিতা নিয়ে একটি গভীর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনাটি এমন একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে তুলে ধরে যেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা **সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলিকে** আইনি চতুরতার মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা আদতে **গণতান্ত্রিক জনম্যান্ডেটের** (Democratic Mandate) পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করছে।

ভারতের দশম তফসিলের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১. **দশম তফসিল কী?**

- **দশম তফসিল** হল একটি সাংবিধানিক বিধান যা **১৯৮৫ সালের ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। একে সাধারণত **দলত্যাগ বিরোধী আইন** (Anti-Defection Law) বলা হয়।
- এই তফসিলটি সংসদের উভয় কক্ষের পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- সহজ কথায়, দশম তফসিলে সেই নিয়মগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে যার অধীনে একজন নির্বাচিত আইনপ্রণেতাকে **দলত্যাগের অভিযোগে** অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে; অর্থাৎ, যদি তারা সেই দলটিকে ত্যাগ করেন বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন যার টিকিটে তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অযোগ্যতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কক্ষের **প্রিসাইডিং অফিসার** (Presiding Officer) নির্ধারণ করেন।

২. **দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রেক্ষাপট**

- **রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং "আয়া রাম, গয়া রাম":** দলত্যাগ বিরোধী আইনের উৎস ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে অনেক ভারতীয় রাজ্যে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নিহিত। **"আয়া রাম, গয়া রাম"** বাক্যাংশটি এই যুগের প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার একজন বিধায়ক এক দিনেই তিনবার তার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেন, যা প্রমাণ করে যে আইনপ্রণেতারা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যকে জনসেবার বদলে ব্যক্তিগত উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।
- **দলত্যাগের ফলাফল এবং মাত্রা:** অনিয়ন্ত্রিত দলত্যাগের ফলে সরকার পতন, বারবার **রাষ্ট্রপতি শাসন** জারি এবং আইনসভার বিশ্বস্ততা নষ্ট হতে থাকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে প্রায় ১৪০টিরও বেশি দলত্যাগের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।
- **কমিটির সুপারিশ এবং আইনি প্রতিক্রিয়া:** ১৯৬৮ সালের **ওয়াই.বি. চ্যবন কমিটি** (Y.B. Chavan Committee) শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ করে। এর ফলে ১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দশম তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **৯১তম সংশোধনীর (২০০৩) মাধ্যমে শক্তিশালীকরণ:** ২০০৩ সালের **৯১তম সংবিধান সংশোধনী আইন** এই আইনটিকে আরও কঠোর করে তোলে। এটি 'বিভাজন' (Split) বা এক-তৃতীয়াংশের দলত্যাগের নিয়মটি বাতিল করে এবং একটি বৈধ একীভূতকরণের (Merger) জন্য আইনসভা দলের **দুই-তৃতীয়াংশ** সদস্যের সম্মতির সীমা নির্ধারণ করে।

৩. **সাংবিধানিক বিধানসমূহ** (Constitutional Provisions)

দশম তফসিল সংবিধানের আরও কয়েকটি ধারার সাথে একত্রে কাজ করে যা দলত্যাগ বিরোধী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গঠন করে:

- **ধারা ১০২(২):** সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে যদি তারা দশম তফসিলের অধীনে অযোগ্য হন।
- **ধারা ১৯১(২):** রাজ্য বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যদের জন্য একই ধরনের অযোগ্যতার বিধান দেয়।
- **ধারা ১৩৬:** অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকার বা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য **বিশেষ লিভ পিটিশন** (Special Leave Petition) মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেয়।
- **ধারা ২২৬:** প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘন বা সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘনের ভিত্তিতে দশম তফসিলের অধীনে নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর হাইকোর্টকে **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) ক্ষমতা প্রদান করে।

৪. **৯১তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০০৩**

এই সংশোধনীটি 'বিভাজন' (Split)-এর ব্যতিক্রমটি বিলুপ্ত করে এবং একীভূতকরণের (Merger) সীমা আইনসভা দলের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বাড়িয়ে **দুই-তৃতীয়াংশ** করে দলত্যাগ বিরোধী আইনকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, এটি মন্ত্রীসভার আকার সংশ্লিষ্ট কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার **১৫% শতাংশের** মধ্যে সীমাবদ্ধ করার নিয়ম চালু করে।

দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল)

১. **অযোগ্যতার শর্তাবলি:** কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য যদি **স্বেচ্ছায়** তার দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, তবে তিনি আইনসভার সদস্যপদ হারাবেন। এ ছাড়াও, যদি কোনো সদস্য দলের নির্দেশ বা **হুইপ** (Whip) অমান্য করে ভোট দেন অথবা ভোটদান থেকে বিরত থাকেন (দলের আগাম অনুমতি ছাড়া), তবে তিনি **অযোগ্য** বলে বিবেচিত হবেন। তবে দলটি যদি ১৫ দিনের মধ্যে ওই সদস্যকে ক্ষমা বা **মার্জনা** (Condone) করে, তবে সদস্যপদ বহাল থাকে।

২. **স্বতন্ত্র সদস্যদের জন্য নিয়ম:** একজন **স্বতন্ত্র সদস্য**, যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি নির্বাচনের পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে সদস্যপদ হারাবেন।

৩. **মনোনীত সদস্যদের জন্য নিয়ম:** একজন **মনোনীত সদস্য** আইনসভায় আসন গ্রহণের দিন থেকে **ছয় মাসের** মধ্যে যেকোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। তবে এই ছয় মাস সময়সীমা পার হওয়ার পর কোনো দলে যোগ দিলে তিনি **অযোগ্য** ঘোষিত হবেন।

৪. **অযোগ্যতা যেখানে প্রযোজ্য নয় (ব্যতিক্রমসমূহ):**

- **দলের একীভূতকরণ:** যদি কোনো দলের অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ** (Two-thirds) সদস্য অন্য কোনো দলের সাথে একীভূত হতে রাজি হন, তবে তাদের দলত্যাগের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না।
- **প্রিসাইডিং অফিসার:** যদি কোনো সদস্য হাউসের **স্পিকার বা চেয়ারম্যান** (Presiding Officer) নির্বাচিত হন, তবে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাময়িকভাবে নিজের দল ত্যাগ করতে পারেন। পদ ছাড়ার পর তিনি পুনরায় দলে ফিরতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তাকে অযোগ্য করা হবে না।

৫. **সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ:** দশম তফসিলের অধীনে অযোগ্যতা সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন সংশ্লিষ্ট কক্ষের **স্পিকার বা চেয়ারম্যান**। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন না এবং এটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলে না।

৬. **নিয়ম তৈরির ক্ষমতা:** প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করার জন্য নিয়ম তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। তবে প্রিসাইডিং অফিসার নিজে থেকে কোনো মামলা শুরু করতে পারেন না; হাউসের অন্য কোনো সদস্য **লিখিত অভিযোগ** জমা দিলেই কেবল ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

৭. **হুইপের ভূমিকা: হুইপ** হলেন সেই ব্যক্তি যিনি দলের সদস্যদের কাছে দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান পৌঁছে দেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী ভোটদান নিশ্চিত করেন। যদি কোনো সদস্য হুইপ অমান্য করেন, তবে তার বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনের অধীনে **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা** নেওয়া যেতে পারে।

দলত্যাগ বিরোধী আইন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়

- **কিহোটো হোল্লোহান বনাম জাচিলু (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট দশম তফসিলের **সাংবিধানিক বৈধতা** বহাল রাখে। আদালত স্পষ্ট করে যে, স্পিকারের সিদ্ধান্ত **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) আওতাধীন। তবে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই কেবল আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।
- **রাজেন্দ্র সিং রানা বনাম স্বামী প্রসাদ মৌর্য (২০০৭):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, স্পিকার অযোগ্যতার আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে **অনির্দিষ্টকাল দেরি** করতে পারেন না। এই ধরনের অযৌক্তিক বিলম্ব সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে অবহেলা হিসেবে গণ্য হবে।
- **সুভাষ দেশাই বনাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (২০২৩):** আদালত **আইনসভা দল** (Legislature Party) এবং **রাজনৈতিক দলের** (Political Party) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে। এতে বলা হয়, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তই আইনপ্রণেতাদের ওপর বাধ্যতামূলক এবং আইনসভা দলের মধ্যে বিদ্রোহ মানেই 'একীভূতকরণ' বা মার্জার নয়।
- **জি.ভি. কৃষ্ণমূর্তি বনাম ভারত সরকার (২০২৩):** সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় জোর দিয়ে বলে যে, অযোগ্যতার মামলাগুলো **যুক্তিসঙ্গত সময়ের** মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা গ্রহণযোগ্য নয়।

দশম তফসিলের গুরুত্ব

- **স্থিতিশীল সরকার নিশ্চিতকরণ:** ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারকে আইনসভায় **সংখ্যাগরিষ্ঠতা** (Majority) বজায় রাখতে হয়। দলত্যাগকে সীমিত করার মাধ্যমে দশম তফসিল রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধ করতে সাহায্য করে এবং নির্বাচিত সরকারকে অন্যায়ভাবে **ক্ষমতাচ্যুত** (Toppled) হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **রাজনৈতিক দুর্নীতি হ্রাস:** ভারতে দলত্যাগ প্রায়শই বিভিন্ন **প্রলোভন** (Inducements)—যেমন আর্থিক সুবিধা, মন্ত্রী পদ, আইনি প্রক্রিয়া থেকে সুরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত লাভের সাথে জড়িত থাকে। **দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন** (2nd ARC, 2008) এই ধরনের প্রলোভন-ভিত্তিক দলত্যাগকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম দূষিত প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি **সাংবিধানিক প্রতিরোধক** (Constitutional Deterrent) হিসেবে কাজ করে।
- **রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ:** একটি সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলো শাসনের **সাংগঠনিক মেরুদণ্ড** (Organisational Backbone) গঠন করে। যখন আইনপ্রণেতারা তাদের দলের ইশতেহার বা প্ল্যাটফর্মের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, তখন দলগুলো সুসংগত এবং **জবাবদিহিমূলক** (Accountable) অবস্থান বজায় রাখতে উৎসাহিত হয়। এটি শেষ পর্যন্ত সুশাসন এবং সঠিক নীতি নির্ধারণে (Policy-making) সহায়তা করে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষা:** এই আইনটি বহিরাগত রাজনৈতিক প্রভাবে রাজ্য সরকারগুলোকে অস্থিতিশীল করার অপব্যবহার রোধ করতে সাহায্য করে। এটি ভারতের **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে** (Federal Structure) সমর্থন করে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে।

দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমালোচনা

- **বাক-স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা (ভিন্নমত দমন):** এই আইন আইনপ্রণেতাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং **বিবেক** (Conscience) অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে। সদস্যরা প্রায়শই দলের নির্দেশ বা **দলীয় লাইন** (Party Line) মেনে চলতে বাধ্য হন, এমনকি যখন সেটি তাদের নিজস্ব বিশ্বাস বা নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়।

- **দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের দুর্বলতা** (Weakening of Intra-Party Democracy): দলত্যাগের জন্য শাস্তির বিধান রেখে এই আইন সদস্যদের ওপর দলীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করে। এটি আইনপ্রণেতাদের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বা অভ্যন্তরীণ মতভেদ প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে, যার ফলে দলের ভেতরে **গণতান্ত্রিক বিতর্ক** (Democratic Debate) হ্রাস পায়।
- **রাজনৈতিক দলের খণ্ডিতকরণকে উৎসাহিত করা** (Encouragement of Party Fragmentation): অযোগ্যতা থেকে বাঁচতে রাজনীতিবিদরা নতুন দল গঠন করতে পারেন বা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হতে পারেন, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার **খণ্ডিতকরণ** (Fragmentation) ঘটায়। এর ফলে স্থিতিশীল সরকার গঠন এবং কার্যকর নীতি রূপায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।
- **প্রিসাইডিং অফিসারের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ** (Concerns Regarding the Role of the Presiding Officer): স্বচ্ছতার অভাব এবং সম্ভাব্য **পক্ষপাতদুষ্টতার** (Bias) কারণে স্পিকার বা চেয়ারম্যানের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। যেহেতু আইনের বিধানগুলো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়, তাই নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—বিশেষ করে যখন বিচার চলাকালীন **বিচার বিভাগীয় তদারকি** (Judicial Oversight) সীমিত থাকে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

- **যুক্তরাজ্য** (United Kingdom): যুক্তরাজ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক দলত্যাগ বিরোধী আইন নেই। পরিবর্তে, আইনপ্রণেতাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা শক্তিশালী **রাজনৈতিক কনভেনশন** (Political Conventions), দলীয় শৃঙ্খলা এবং ভোটারদের প্রতি **জবাবদিহিতার** (Accountability) ওপর নির্ভর করে।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা** (South Africa): দক্ষিণ আফ্রিকায় আগে নিয়ন্ত্রিত শর্তে 'ফ্লোর ক্রসিং' বা দলবদলের অনুমতি ছিল; তবে এর ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই বিধানটি শেষ পর্যন্ত **বাতিল** (Abolished) করা হয়।
- **বাংলাদেশ** (Bangladesh): বাংলাদেশে অত্যন্ত **কঠোর দলত্যাগ বিরোধী আইন** রয়েছে। সেখানে দলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে ভোটদান থেকে বিরত থাকলেও সদস্যপদ বাতিল বা অযোগ্য ঘোষণা হতে পারে, যা দলের অভ্যন্তরে কঠোর শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।
- **জার্মানি – কনস্ট্রাকটিভ ভোট অফ নো কনফিডেন্স:** জার্মান সংবিধানের (Basic Law) **ধারা ৬৭** এর অধীনে, একটি সরকারকে কেবল তখনই ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব যদি আইনসভা একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে একজন নতুন চ্যান্সেলর নির্বাচিত করে। এটি **সুবিধাবাদী দলত্যাগ** (Opportunistic Defections) রোধ করে এবং কেবল একটি কার্যকর বিকল্প সরকার থাকা সাপেক্ষে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যৎ পথ: দলত্যাগ বিরোধী আইনকে শক্তিশালীকরণ

- **সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে একীভূতকরণ** (Merger) **সংক্রান্ত ধারা স্পষ্ট করা:** সংসদের উচিত আইনটি সংশোধন করে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে, একটি বৈধ একীভূতকরণ বা মার্জার অবশ্যই **সমগ্র রাজনৈতিক দলের** (Political Party) অনুমোদিত বডি দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কেবল আইনসভা দলের (Legislature Party) দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা নয়। এটি বর্তমানে বিদ্যমান আইনি ফাঁকফোকরগুলি বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
- **অযোগ্য ঘোষণার ক্ষমতা একটি স্বাধীন সংস্থার হাতে অর্পণ:** অযোগ্যতা সংক্রান্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা স্পিকার বা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সরিয়ে একটি **স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের** হাতে দেওয়া উচিত। ল কমিশন (১৭০তম রিপোর্ট, ১৯৯৯) এবং সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিশন (২০০২) উভয়ই এই ভূমিকা **ভারতের নির্বাচন কমিশন** (ECI) বা একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।
- **সময়াবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা:** একটি আইনি বিধান থাকা উচিত যেখানে সমস্ত অযোগ্যতার আবেদন **৩ মাসের নির্দিষ্ট সময়ের** মধ্যে নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি প্রিসাইডিং অফিসার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন, তবে মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন কমিশন বা ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত।

- **দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রসার:** দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (২০০৮)-এর পরামর্শ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে **অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র (Intra-Party Democracy)** প্রয়োগের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা থাকলে জোরপূর্বক দলত্যাগের প্রবণতা হ্রাস পাবে।
- **কঠোর নির্বাচনী প্রতিবন্ধক (Electoral Deterrent) তৈরি:** দলত্যাগের কারণে অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের অন্তত **৫ বছরের জন্য** নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত। এটি দলত্যাগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে এবং সুবিধাবাদী দলবদলকে নিরুৎসাহিত করবে।
- **সময়োপযোগী বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ:** ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উচিত **ধারা ১৪২ (Article 142)** এর অধীনে তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে এই ধরনের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা এবং স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা।

উপসংহার

দশম তফসিল একটি **সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional Guarantee)** হিসেবে কাজ করে যাতে নির্বাচনের পরবর্তী সুবিধাবাদের মাধ্যমে ভোটারের ম্যান্ডেট বা রায় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হয়। তবে ভুল ব্যাখ্যা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণে এর যে অবক্ষয় ঘটছে, তা নিরসনে জরুরি ও অর্থবহ সংস্কার প্রয়োজন। ভারতের গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক রাখতে আইনি স্পষ্টতা, একটি **স্বতন্ত্র বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা (Independent Adjudicatory Mechanism)** এবং দ্রুত বিচারিক হস্তক্ষেপ এখন আর বিকল্প নয়—এগুলি এখন **অপরিহার্য (Indispensable)**।

Q. While the Anti-Defection Law under the Tenth Schedule was enacted to ensure political stability, it has increasingly come under criticism for weakening democratic principles. Critically examine. (15 Marks)

1.1.2. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি **দিল্লি হাইকোর্ট** "ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি অনেক সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ছাড়িয়ে **প্রকাশ্যে অপমান করার হাতিয়ার** হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কী?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে সাধারণ নাগরিকরা ডিজিটাল মাধ্যম—প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে—এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং **"শাস্তি"** দেওয়ার চেষ্টা করে, যাদের তারা কোনো আইনি বা নৈতিক অপরাধে দোষী বলে মনে করে। সাধারণ ভিজিল্যান্টিজমে শারীরিক সংঘাত হতে পারে, কিন্তু ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার** করে কাজ করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মূল বৈশিষ্ট্য

- **ক্রাউডসোর্সড অ্যাকশন (Crowdsourced Action):** এতে প্রায়ই "পাইল-অন" প্রভাব দেখা যায়, যেখানে হাজার হাজার অপরিচিত মানুষ একটি অভিযোগ শেয়ার করে, মন্তব্য করে এবং সেটিকে ছড়িয়ে দেয়।
- **ডক্সিং (Doxxing):** এটি একটি সাধারণ কৌশল যেখানে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য (বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, কর্মস্থল) ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেওয়া হয় যাতে তাকে বাস্তবে হয়রানি করা যায়।

- **পাবলিক শেমিং (Public Shaming):** এর মূল লক্ষ্য থাকে প্রায়ই **"সামাজিক মৃত্যু"**—অর্থাৎ একজন ব্যক্তির সম্মান, জীবিকা বা সামাজিক অবস্থান ধ্বংস করা।
- **আইনি প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া (Bypassing Due Process):** এটি প্রচলিত আইনি ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে এবং একই সাথে তদন্তকারী, বিচারক ও জল্লাদের ভূমিকা পালন করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের আইনি ও সাংবিধানিক দিক

- **মৌলিক অধিকার:** সংবিধানের **ধারা ১৯(১)(এ)** অনলাইনে মতপ্রকাশের অধিকার দেয়, তবে **ধারা ১৯(২)** রাষ্ট্রকে মানহানি, জনশৃঙ্খলা রক্ষা বা নৈতিকতার স্বার্থে এই অধিকারের ওপর **"যৌক্তিক বিধিনিষেধ"** আরোপ করার অনুমতি দেয়।
- **সম্মানের অধিকার:** সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে, একজন ব্যক্তির সম্মান বা খ্যাতি **ধারা ২১**-এর অধীনে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে যথেচ্ছ সামাজিক অপমান থেকে রক্ষা করে।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের নীতি (Principles of Natural Justice):** এটি অভিযুক্তের **পক্ষ সমর্থনের সুযোগ** এবং **দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ** গণ্য হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। ডিজিটাল জনতা (Mob) তাৎক্ষণিক "রায়" দিয়ে এই নীতিগুলো লঙ্ঘন করে।
- **প্রাসঙ্গিক আইনি বিধান:** IPC-**এর ৪৯৯-৫০০ ধারা** মানহানির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার দেয়। অন্যদিকে, IT Act বা তথ্যপ্রযুক্তি আইন প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কেন সৃষ্টি হয়?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার** একটি উপজাত (Byproduct) হিসেবে আবির্ভূত হয়। যখন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সময়মতো বা কার্যকর সমাধান দিতে পারে না, তখন জনগণ নিজেরাই বিচার করতে রাস্তায় (বা ইন্টারনেটে) নামে।

- **পদ্ধতিগত উদাসীনতা:** পুলিশ, বিচার বিভাগ বা বড় সংস্থাগুলোর ওপর মানুষের আস্থার অভাব। মানুষ মনে করে যে যৌন হয়রানি বা দুর্নীতির মতো অভিযোগের প্রতিকার তারা দ্রুত বা সঠিকভাবে পাবে না।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** যেখানে আইনি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এটি পাবলিক শেমিং বা সামাজিক অপমানের মাধ্যমে ধীরগতির প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।
- **যৌথ অসহায়ত্ব:** সাধারণ মানুষ ব্যবস্থার কাছে নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে; ডিজিটাল "মব" বা জনতা তাদের মধ্যে একটি ক্ষমতায়নের অনুভূতি এবং তাৎক্ষণিক মানসিক প্রশান্তি তৈরি করে।
- **প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতা:** ইন্টারনেটের ছদ্মনাম, গতি এবং বিশাল পরিধি প্রচলিত বাধাগুলোকে এড়িয়ে খুব কম খরচে বড় ধরনের **"প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা"** নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।
- **সংহতির সন্ধান:** যখন ভুক্তভোগীরা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত বা দোষারোপের শিকার হন, তখন তারা ডিজিটাল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থন এবং স্বীকৃতি খোঁজেন।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের ইতিবাচক দিক

- **নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর:** এটি বিচারের গণতন্ত্রীকরণ করে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষজন পক্ষপাতদুষ্ট আইনি বাধা এড়িয়ে সরাসরি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই **"বিশাল সমতাকারী" (Great Equalizer)** ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করে যে, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি নেই তারাও যেন জনসাধারণের সমর্থন ও স্বীকৃতি পায়।
- **জবাবদিহিতার কৌশল:** ইন্টারনেটে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানের সুনামের ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি উদাসীন কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ সেল বা তদারকি কমিটি ব্যর্থ হয়, সেখানে এটি সেই শূন্যতা পূরণ করে।

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো জনসমক্ষে আনার ফলে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্যের মতো পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো নিয়ে সমাজে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই **যৌথ দৃশ্যমানতা** অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী নীতি পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
- **গতি:** যেখানে আইনি লড়াই শেষ হতে বছরের পর বছর সময় লাগে, সেখানে **"জনসাধারণের আদালত"** তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেয়। এই দ্রুত প্রতিক্রিয়া ভুক্তভোগীকে মানসিক শান্তি দেয় এবং রিয়েল-টাইমে অপরাধ বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের লঙ্ঘন:** এতে প্রায়ই "Audi alteram partem" (অপর পক্ষের কথা শোনা) নীতিটি উপেক্ষা করা হয়। ইন্টারনেট এখানে একপাক্ষিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কাজ করে যেখানে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় না। এর ফলে একটি "প্রমাণিত হওয়ার আগেই দোষী" পরিবেশ তৈরি হয়, যা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে।
- **মিডিয়া ট্রায়াল:** জনমত এবং ইন্টারনেটের ক্ষোভ কার্যকরভাবে আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রক্রিয়ার জায়গা দখল করে নেয়। কোনো তথ্য আইনত পরীক্ষা করার আগেই "রায়" দিয়ে দেওয়া হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং সমাজের চোখে আগেভাগেই একজনকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে।
- **মিথ্যা অভিযোগ:** সোশ্যাল মিডিয়ায় সঠিক যাচাইকরণ ব্যবস্থার অভাবে ভিত্তিহীন বা বিদ্বেষমূলক দাবিগুলো অবাধে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে **অপূরণীয় সম্মানের হানি** হওয়ার ঝুঁকি থাকে, কারণ পরে যদি কোনো ভুল সংশোধনও করা হয়, তা মূল ভাইরাল হওয়া মিথ্যার মতো সমান সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় না।
- **উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতা:** অনলাইন ক্ষোভ দ্রুত **"ডিজিটাল লিঞ্চিং"** বা গণপিটুনিতে রূপ নিতে পারে। যেখানে যৌথ ক্রোধ শেষ পর্যন্ত হয়রানি, পিছু নেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকিতে পরিণত হয়। এই আক্রমণাত্মক পরিবেশ গঠনমূলক বিচারের চেয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- **গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Privacy Violations): "ডক্সিং"** (Doxxing) বলতে কারও ব্যক্তিগত তথ্য যেমন—বাড়ির ঠিকানা বা ব্যক্তিগত কন্টাক্ট নম্বর ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করাকে বোঝায়। ব্যক্তিগত তথ্যের এই অপব্যবহার ব্যক্তি ও তার পরিবারকে শারীরিক ঝুঁকির মুখে ফেলে এবং গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।
- **বাক-স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব:** ডিজিটাল মব বা "সামাজিক অপমানের" শিকার হওয়ার ভয়ে অনেকে ভিন্নমত বা অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে সাহস পান না। এর ফলে মানুষ নিজের ওপর নিজেই সেন্সরশিপ আরোপ করে, যা উন্মুক্ত আলোচনাকে স্তব্ধ করে দেয় এবং সুস্থ সামাজিক বিতর্কের জায়গা সংকুচিত করে।

কেস স্টাডি

বিমান পরিষেবা বিভ্রাট (২০২২): এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসে একজন পুরুষ যাত্রী এক বৃদ্ধার গায়ে প্রস্রাব করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনরোষ তৈরি হওয়ার পরই কেবল বিমান সংস্থাটি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

পথনির্দেশ

- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকার শক্তিশালী করা:** ভুক্তভোগীরা যেন সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারস্থ না হয়, সেজন্য প্রতিটি সংস্থায় শক্তিশালী ও সময়োপযোগী অভিযোগ কেন্দ্র (যেমন- **অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি** বা **"নো-ফ্লাই" লিস্ট**) কার্যকর করা প্রয়োজন।
- **বিচার বিভাগ ও পুলিশ সংস্কার:** আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। এতে বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ফিরবে এবং আদালতই বিচারের প্রধান জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

- **ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা:** গণমাধ্যম এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের উচিত কোনো অভিযোগ প্রচার করার আগে তা ভালভাবে যাচাই করা (Verification-First)। এতে ভুল তথ্য ছড়ানো এবং কারও সম্মানহানি রোধ করা সম্ভব হবে।
- **DPDP আইন ও RTBF-এর প্রয়োগ: ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন** (DPDP Act, 2023) এবং **"ভুলে যাওয়ার অধিকার"** (Right to be Forgotten) কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে মানুষ মিথ্যা বা পুরনো অপমানজনক তথ্য ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।
- **ধারা ১৯ এবং ২১-এর মধ্যে ভারসাম্য:** রাষ্ট্রকে এমন নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে যা বৈধ অনলাইন সক্রিয়তা এবং ক্ষতিকর ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নিশ্চিত করতে হবে যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (ধারা ১৯) কারও ন্যায্য বিচারের অধিকারকে (ধারা ২১) নষ্ট না করে।

উপসংহার

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম হলো প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতার একটি লক্ষণ। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে আমাদের অবশ্যই আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, দ্রুত এবং সহানুভূতিশীল করতে হবে, যাতে **"মব জাস্টিস"** বা গণবিচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

Q. "Digital vigilantism is less a problem of social media excess and more a reflection of institutional failure." Critically examine. (15 Words)

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ

ভূমিকা

- বর্তমান বিশ্বজুড়ে যখন সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) বিপর্যস্ত এবং রক্ষণশীলতা (Protectionism) বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ভারত নিউজিল্যান্ডের সাথে একটি ঐতিহাসিক **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** স্বাক্ষর করেছে। এটি ভারতের দ্রুততম সম্পাদিত চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম।
- এটি **"বিকশিত ভারত ২০৪৭"** ভিশনের অধীনে ভারতের পরিবর্তিত বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির একটি প্রতিফলন, যেখানে ভারত শুল্ক-কেন্দ্রিক মধ্যস্থতাকারী থেকে একটি কৌশলগত এবং উচ্চ-গতিসম্পন্ন বাণিজ্য অংশীদারে রূপান্তরিত হয়েছে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** হলো দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে একটি চুক্তি যা পণ্য, পরিষেবা, মূলধন এবং শ্রমের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে শুল্ক, কোটা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ হ্রাস বা বিলুপ্ত করে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সম্পর্ক: ভিত্তি

১. **ঐতিহাসিক সম্পর্ক**

- **১৯৫২ সালে** আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৫) গ্যালিপোলিতে ANZAC বাহিনীর সাথে ভারতীয় সৈন্যরা লড়াই করেছিল, যা একটি গভীর ঐতিহাসিক বন্ধন তৈরি করেছে।
- উভয় দেশই কমনওয়েলথের সদস্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাধারণ আইন (Common Law) ঐতিহ্য শেয়ার করে। উভয় দেশই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি **নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থা** (Rules-based order) সমর্থন করে।

২. **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য**

- ২০২৪ সালে পণ্য ও পরিষেবার মোট বাণিজ্য **২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে। ২০২৪-২৫ সালে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য ৪৯% বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- ভারতের বাণিজ্যের ভারসাম্য ইতিবাচক, অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানির তুলনায় ভারত রপ্তানি বেশি করে। ওশেনিয়া অঞ্চলে নিউজিল্যান্ড ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** বাণিজ্য অংশীদার।

৩. **বাণিজ্যের গঠন**

- **ভারত রপ্তানি করে:** ওষুধ (Pharmaceuticals), যন্ত্রপাতি, বস্ত্র এবং মূল্যবান পাথর।
- **নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানি করে:** উল (Wool), লোহা ও ইস্পাত, ফল ও বাদাম এবং অ্যালুমিনিয়াম।

৪. **প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকা (Diaspora Bridge)**

- নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত প্রায় **৩,০০,০০০ ভারতীয় বংশোদ্ভূত**, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫-৬%। এই গোষ্ঠী দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা বিনিময় এবং পর্যটন এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

৫. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা**

- ২০২৫ সালের শুরুতে স্বাক্ষরিত একটি **দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি** সামরিক ব্যস্ততা এবং নৌ-বন্দরে পরিদর্শন বৃদ্ধি করেছে। নিউজিল্যান্ড ভারতের Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI)-এর সাথেও একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

৬. **বহুপাক্ষিক সহযোগিতা**

- নিউজিল্যান্ড রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ এবং নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে (NSG) ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন জানায়।
- এছাড়াও তারা ভারতের নেতৃত্বাধীন International Solar Alliance (ISA) এবং CDRI-এর সক্রিয় সদস্য।

ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) কৌশলগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **ভারতীয় রপ্তানির জন্য নজিরবিহীন বাজার সুবিধা**

- **১০০% শুল্কমুক্ত সুবিধা:** নিউজিল্যান্ড ভারতীয় রপ্তানির ওপর থেকে সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। এর ফলে MSME, টেক্সটাইল, চামড়া, পাদুকা এবং রত্ন ও অলঙ্কারের মতো শ্রমনিবিড় খাতগুলো ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে, যেখানে আগে ১০% পর্যন্ত শুল্ক ছিল।
- **ভারতের শুল্ক ছাড়:** ভারত ৭০.০৩% শুল্ক লাইনে উদারীকরণের প্রস্তাব দিয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রায় ৯৫% কভার করে। এর মধ্যে ৩০% ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক শুল্ক বিলোপ হবে এবং বাকিগুলো ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কমানো হবে।
- **উৎপাদন খরচ হ্রাস:** ভারত কাঠের গুঁড়ি, কোকিং কোল এবং ধাতব স্ক্র্যাপের মতো শিল্প কাঁচামালে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যা সরাসরি **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**-কে শক্তিশালী করবে।

২. **সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ খাতের সুরক্ষা**

- **কৌশলগত বর্জন তালিকা (Exclusion List):** দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে ভারত ২৯.৯৭% শুল্ক লাইনকে এই চুক্তির বাইরে রেখেছে।
  - **বর্জিত পণ্য:** সমস্ত **দুগ্ধজাত পণ্য** (তরল দুধ, পনির, দই), পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, ভুট্টা, চিনি, অ্যালুমিনিয়াম এবং অস্ত্রশস্ত্র।

- **ডেয়ারি রেড লাইন:** দুগ্ধজাত পণ্যকে তালিকার বাইরে রাখা ভারতের জন্য একটি বড় জয়, যা নিউজিল্যান্ডের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য থেকে ভারতের কোটি কোটি ক্ষুদ্র দুগ্ধচাষীকে রক্ষা করবে।
- **শুল্ক হার কোটা (TRQ) ব্যবস্থা:** আপেল, কিউই ফল এবং মানুকা মধুর মতো পণ্যগুলো TRQ-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে, যাতে বাজারের চাহিদা এবং কৃষকদের সুরক্ষা—উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. **বিশাল প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) প্রতিশ্রুতি**

- **২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ:** নিউজিল্যান্ড আগামী ১৫ বছরে ভারতে এগ্রি-টেক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে **২০ বিলিয়ন ডলার** বিনিয়োগের আইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
- **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause):** যদি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়, তবে তা মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪. **প্রতিভা ও মানব মূলধনের গতিশীলতা**

- **৫,০০০ পেশাদার ভিসা:** আইটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের দক্ষ ভারতীয়দের জন্য বছরে ৫,০০০টি **অস্থায়ী কর্মসংস্থান ভিসা** (৩ বছর পর্যন্ত) বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **ছাত্র-বান্ধব বিধান:** ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ওপর থেকে সীমা তুলে নেওয়া হয়েছে। তারা পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন এবং STEM গ্র্যাজুয়েটরা ৩-৪ বছরের 'পোস্ট-স্টাডি' কাজের অধিকার পাবেন।

৫. **পরিষেবা, আয়ুষ (AYUSH) ও সাংস্কৃতিক কূটনীতি**

- **আয়ুষ-এর স্বীকৃতি:** এটিই প্রথম দ্বিপাক্ষিক FTA যেখানে ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি—**আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি (AYUSH)**-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **সাংস্কৃতিক অধ্যায়:** ঐতিহ্যগত জ্ঞান, খেলাধুলা এবং পর্যটনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. **মেধাস্বত্ব ও জিআই (GI) সুরক্ষা**

- **জিআই আইনের সংশোধন:** নিউজিল্যান্ড তাদের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে **দার্জিলিং চা, বাসমতি চাল**-এর মতো আইকনিক ভারতীয় পণ্যগুলো নিউজিল্যান্ডের বাজারে সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা পাবে।
- **পারস্পরিক স্বীকৃতি (MRA):** বাসমতি চাল, চা এবং তিসি বীজের মতো ৮০টিরও বেশি জৈব (Organic) পণ্য এখন সহজেই নিউজিল্যান্ডের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

৭. **বাণিজ্য সহজীকরণ ও ফার্মা সেক্টর**

- **দ্রুত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স:** পণ্য খালাসের সময় কমিয়ে ২৪-৪৮ ঘণ্টা করা হয়েছে এবং কাগজের পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- **ফার্মা ফাস্ট-ট্র্যাক:** মার্কিন FDA বা ইউরোপীয় EMA দ্বারা অনুমোদিত ভারতীয় ওষুধগুলোকে নিউজিল্যান্ড পুনরায় পরিদর্শন ছাড়াই দ্রুত অনুমোদন দেবে। এর ফলে ওষুধ রপ্তানির খরচ কমবে।

৮. **ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব**

- **ওশেনিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশদ্বার:** এই চুক্তির ফলে নিউজিল্যান্ডকে একটি লজিস্টিক হাব হিসেবে ব্যবহার করে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর (PICs) বাজারে পৌঁছাতে পারবে।
- **OECD মানদণ্ড:** নিউজিল্যান্ডের উচ্চমানের মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বমানের সরবরাহ শৃঙ্খলে যুক্ত হতে সক্ষম।

- **দ্রুততম সম্পাদন:** মাত্র ৯ মাসে (মার্চ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫) এই আলোচনা শেষ হয়েছে, যা ভারতের ইতিহাসে দ্রুততম FTA সম্পাদন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড FTA-র প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **FTA-র সাফল্যে চীনের প্রভাব (China Shadow):** নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ (রপ্তানির প্রায় ৩০%) **চীনের ওপর নির্ভরশীল**। এই নির্ভরতা নিউজিল্যান্ডকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিবাদে ভারতের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে, যা এই চুক্তির কৌশলগত গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।
- **বিনিয়োগ বাস্তবায়নের ঝুঁকি (Investment Delivery Risk):** আগামী ১৫ বছরে **২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক কঠোর তদারকি না থাকলে প্রকৃত মূলধন প্রবাহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হতে পারে। যদিও চুক্তিতে **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause)**-র ব্যবস্থা আছে, তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে উভয় পক্ষের নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর।
- **দুগ্ধ খাতের সুরক্ষা বনাম কৃষি প্রত্যাশা:** ভারত দুগ্ধজাত পণ্যকে **বর্জন তালিকায় (Exclusion List)** রেখে সুরক্ষা দিলেও, পরবর্তী সাত বছরে 'ইনফ্যান্ট ফর্মুলা' এবং উচ্চ-মূল্যের দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য পর্যায়ক্রমে বাজার উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেশীয় পুষ্টি খাতের ওপর প্রতিযোগিতামূলক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- **নিরাপত্তা সংক্রান্ত টানাপোড়েন — খালিস্তান ইস্যু:** নিউজিল্যান্ডের উদারপন্থী নীতির সুযোগ নিয়ে সেখানে **খালিস্তানপন্থী উপাদানগুলোর** উপস্থিতি কূটনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে চুক্তির অধীনে থাকা **প্রতিভার গতিশীলতা (Talent Mobility)** এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পৃক্ততার মতো বিষয়গুলো বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **বাস্তবায়নের জন্য দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** চুক্তির সফল রূপায়ণের জন্য শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। বর্তমানে **সন্ত্রাসবাদ দমন**, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাব রয়েছে, যা এই অংশীদারিত্বের **কৌশলগত গভীরতা (Strategic Depth)** কমিয়ে দেয়।
- **লেনদেনমূলক মানসিকতা (Transactional Mindset):** নিউজিল্যান্ড এখনও ভারতকে মূলত **শ্রমের উৎস** এবং **শিক্ষার গন্তব্য** হিসেবে দেখে, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত সম্পর্কের পথে বাধা। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি **ডিপ-টেক (Deep-tech)**, প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন এবং কৌশলগত মূলধনের ক্ষেত্রে চুক্তির সম্ভাবনাকে সীমিত করতে পারে, যা **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশিকা: ভারত-নিউজিল্যান্ড FTA শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

- **২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা:** এগ্রি-টেক, নবায়নযোগ্য শক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে পুঁজির প্রবাহ তদারকি করার জন্য উভয় দেশের একটি **যৌথ বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ কমিটি (Joint Investment Monitoring Committee)** গঠন করা উচিত। চুক্তির **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause)** ধারাটি শুরুতেই সক্রিয় করলে বিনিয়োগের ঘাটতি কূটনৈতিক সমস্যায় পরিণত হবে না।
- **ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি:** ১১৮টি পরিষেবা খাতের সুবিধা নিতে ভারতকে তার **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UPI, Aadhaar, ONDC)** ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে MSME রপ্তানি, ডিজিটাল বাণিজ্য এবং ফিনটেক পরিষেবাকে উৎসাহিত করে আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য **৫ বিলিয়ন ডলারের** লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে।
- **কৃষি ও জিআই (GI) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন:** ভারতকে অবিলম্বে Centres of Agricultural Excellence সক্রিয় করতে হবে এবং দুগ্ধ শিল্পের আধুনিকীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর যৌথ গবেষণা চালাতে হবে। পাশাপাশি, নিউজিল্যান্ড যাতে ১৮ মাসের মধ্যে তাদের **জিআই (GI) আইন সংশোধন** সম্পন্ন করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে ওশেনিয়া অঞ্চলে **দার্জিলিং চা** এবং **বাসমতি চালের** মতো ব্র্যান্ডগুলো আইনি সুরক্ষা পাবে।

- **FTA-এর সুফল রক্ষায় নিরাপত্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** খালিস্তান ইস্যু এবং আন্তঃসীমান্ত চরমপন্থা মোকাবিলায় একটি দ্বিপাক্ষিক **সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কাঠামো** এবং **Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)** স্থাপন করা জরুরি। এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত টানাপোড়েন নিরসন না হলে প্রতিভা ও জনশক্তির গতিশীলতা (Talent Mobility) বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **ভবিষ্যৎ-মুখী খাতের জন্য FTA-কে ব্যবহার:** ২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিকে **গ্রিন হাইড্রোজেন**, মহাকাশ গবেষণা, ক্লিন টেকনোলজি এবং **AI-চালিত ফিনটেক** খাতে চালিত করতে হবে। এটি সম্পর্কটিকে কেবল বাণিজ্যিক লেনদেনের গণ্ডি থেকে বের করে **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্য পূরণে একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত জোটে পরিণত করবে।
- **প্রবাসী ভারতীয় ও ইন্দো-প্যাসিফিক সংযোগ কাজে লাগানো:** নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত **৩ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে** পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা এবং **আয়ুষ (AYUSH)** বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। একইসাথে, নিউজিল্যান্ডকে প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করে IPOI-এর অধীনে **প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর (PICs)** সাথে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর করতে হবে।

উপসংহার

- ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) হলো একটি **পরবর্তী প্রজন্মের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব**, যা কৃষক, MSME, নারী, যুবক এবং স্টার্টআপদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। এই চুক্তির ফলে উন্নত অর্থনীতির ৩৮টি দেশের সাথে ভারতের মোট ৯টি চুক্তি সম্পন্ন হলো, যা বিশ্ব জিডিপি-র প্রায় ৬৫-৭০% কভার করে।
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির ঊর্ধ্বে এটি একটি ভূ-রাজনৈতিক বার্তা। এটি বিশ্বমঞ্চে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্যে ভারতের দৃঢ় পদযাত্রাকেই প্রতিফলিত করে।

Q. Free Trade Agreements are no longer just economic tools but instruments of geopolitical strategy. Analyse this statement in the context of the India-New Zealand FTA. (15 Marks)

1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.3.1. সুরক্ষা থেকে সেবা: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের পথ

ভূমিকা

- ভারতের জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্র বর্তমানে একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। **আয়ুষ্মান ভারত (PMJAY)**-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বীমার আওতায় আসার ফলে **আর্থিক সুরক্ষা** বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাটি আজও পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মান, সাধ্য এবং সাম্যের গভীর **কাঠামোগত ঘাটতির** সঙ্গে লড়াই করছে।
- ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (NSO) কর্তৃক প্রকাশিত **৮০তম দফার হাউসহোল্ড সোশ্যাল কনজাম্পশন (হেলথ) সার্ভে**—যা কোভিড-পরবর্তী ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাস্থ্য সমীক্ষা—তা থেকে জানা যায় যে, কেবল একটি **বীমা কার্ড** থাকলেই হাসপাতালে বেড বা সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত হয় না। তাই **'কভারেজ' (বীমা সুরক্ষা) থেকে 'কেয়ার' (প্রকৃত পরিষেবা)** পর্যন্ত পৌঁছানোই এখন ভারতের স্বাস্থ্যনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পটভূমি: NSO ৮০তম রাউন্ড স্বাস্থ্য সমীক্ষার মূল তথ্য

- **সমীক্ষার পরিধি:** NSO-র এই সমীক্ষাটি মহামারী পরবর্তী এবং **প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY)** পূর্ণতা পাওয়ার পর পরিচালিত হয়েছে। এতে প্রায় ১.৩৯ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগের সমীক্ষাগুলোতে দেখা গিয়েছিল যে অধিকাংশ ভারতীয়র কোনো স্বাস্থ্য বীমা ছিল না।

ক. স্বাস্থ্য-সন্ধানী আচরণ

- **অসুস্থতার হার (PPRA) প্রায় দ্বিগুণ:** অসুস্থতা রিপোর্ট করার হার (PPRA) গ্রামীণ এলাকায় ৬.৮% থেকে বেড়ে **১২.২%** এবং শহরাঞ্চলে ৯.১% থেকে বেড়ে **১৪.৯%** হয়েছে। এটি স্বাস্থ্যের অবনতি নয়, বরং মানুষের মধ্যে **সচেতনতা এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা** বৃদ্ধির সংকেত।
- **রোগতাত্ত্বিক পরিবর্তন (Epidemiological Transition):** ভারতে সংক্রামক ব্যাধি কমছে এবং **অসংক্রামক রোগ (NCDs)** যেমন—ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ বাড়ছে। আইইসি (IEC) প্রচারণা এবং কমিউনিটি স্ক্রিনিংয়ের ফলে এই রোগগুলো দ্রুত শনাক্ত হচ্ছে।

খ. পকেট থেকে খরচ

- **হাসপাতালে ভর্তির খরচ:** অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তির খরচ কম থাকে; কেবল ক্যান্সার বা বড় অস্ত্রোপচারের মতো ব্যয়বহুল ক্ষেত্রগুলোই গড় খরচ বাড়িয়ে দেয়। সরকারি সুবিধায় হাসপাতালে ভর্তির জন্য **গড় খরচ মাত্র ১,১০০ টাকা** এবং বহির্বিভাগে (OPD) খরচ প্রায় শূন্য।
- **সরকারি উদ্যোগের প্রভাব:** সরকারের **বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা (FDSI)**, বিনামূল্যে রোগনির্ণয় উদ্যোগ এবং ১.৮৪ লক্ষ **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAMs)** এই খরচ কমাতে বড় ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে সমাজের দরিদ্রতম স্তরের মানুষের পকেট থেকে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে।

গ. স্বাস্থ্য বীমার আওতা

- **তিন গুণ বৃদ্ধি:** PMJAY এবং রাজ্য সরকারগুলোর প্রকল্পের ফলে বীমার আওতা গ্রামীণ এলাকায় ১২.৯% থেকে বেড়ে **৪৫.৫%** এবং শহরে ৮.৯% থেকে বেড়ে **৩১.৮%** হয়েছে। এটি দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিকিৎসার বিশাল ঋণের হাত থেকে রক্ষা করছে।

ঘ. সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার

- **বহির্বিভাগ পরিষেবা (OPD):** গ্রামীণ এলাকায় সরকারি কেন্দ্রে চিকিৎসার হার ২৮% থেকে বেড়ে **৩৫%** হয়েছে। প্রতিরোধমূলক এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয় পরিষেবার উন্নতির ফলে সাধারণ মানুষের সরকারি ব্যবস্থার প্রতি ভরসা বাড়ছে।

ঙ. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য

- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব (Institutional Deliveries):** হাসপাতালে প্রসবের হার গ্রামীণ এলাকায় ৯০.৫% থেকে বেড়ে **৯৫.৬%** হয়েছে।
- **সরকারি প্রকল্পের সুফল:** জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রভাবে বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার **৬৬.৮% প্রসব সরকারি হাসপাতালেই** সম্পন্ন হচ্ছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. সরকারি হাসপাতালের কাঠামোগত দুর্বলতা

- **বাজেট বরাদ্দ:** ভারত স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি-র (GDP) মাত্র **২.১%** ব্যয় করে (২০২১-২২), যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশকৃত ৫%-এর চেয়ে অনেক কম। ব্রাজিল (৯.৬%) বা থাইল্যান্ডের (৩.৭%) মতো দেশগুলো ভারতের তুলনায় অনেক বেশি খরচ করে।

- **শয্যা সংকট:** ভারতে প্রতি ১,০০০ জন মানুষের জন্য মাত্র **০.৫৫টি** হাসপাতালের বেড রয়েছে, যেখানে WHO-এর মানদণ্ড হলো প্রতি ১,০০০ জনে ৩টি বেড। এটি সরকারি খাতের দীর্ঘস্থায়ী **পরিকাঠামো ঘাটতিকে** প্রকাশ করে।
- **জনবল সংকট:** ভারতে প্রতি ১,০০০ জন মানুষের বিপরীতে মাত্র **০.৬৫ জন ডাক্তার** রয়েছেন (WHO-এর সুপারিশ ১ জন)। বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় এই সংকট প্রকট।
- **দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থা:** বেসরকারি হাসপাতালগুলো উন্নত ও সুপার-স্পেশালিটি চিকিৎসায় আধিপত্য বিস্তার করছে, অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থা মূলত প্রাথমিক এবং সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২. **প্রকৃত সেবা ছাড়াই বীমা কভারেজ**

- **হাসপাতালের অনীহা:** PMJAY-এর রিইম্বারসমেন্ট বা প্রতিদান হার বাজার মূল্যের চেয়ে কম হওয়ায় অনেক বেসরকারি হাসপাতাল এই তালিকায় নাম লেখাতে চায় না। ফলে রোগীদের অনেক সময় আলাদাভাবে খরচ বহন করতে হয়।
- **ব্যবহারিক বর্জন:** বীমার আওতায় আসা মানুষের সংখ্যা তিন গুণ বাড়লেও, হাসপাতালে ভর্তির হার ২০১৪-পূর্ব স্তরে ফেরেনি। এটি প্রমাণ করে যে, খাতায়-কলমে বীমা থাকলেও দরিদ্র মানুষ এখনও **প্রকৃত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত**।
- **সচেতনতার অভাব:** নিজেদের অধিকার এবং তালিকাভুক্ত হাসপাতাল সম্পর্কে ধারণার অভাবে বীমার ব্যবহার কম হচ্ছে, বিশেষ করে নারী, বয়স্ক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

৩. **প্রতিরোধমূলক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসায় অর্থের অভাব**

- **অ-সংক্রামক রোগ (NCD):** বর্তমানে ভারতে মোট মৃত্যুর ৬০%-এর বেশি ঘটে অ-সংক্রামক রোগের কারণে (ICMR, ২০২৩)। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- **তহবিলের ঘাটতি:** 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির' (AAM) নেটওয়ার্ক বিনামূল্যে ওষুধ ও রোগনির্ণয় পরিষেবা দিলেও, NCD ব্যবস্থাপনার তুলনায় এর বাজেট অত্যন্ত অপ্রতুল।
- **জেনেরিক ওষুধের দুষ্প্রাপ্যতা:** গ্রামীণ এলাকায় 'জনৌষধি কেন্দ্র' (PMBJP)-এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা এখনও অনিয়মিত।

৪. **আর্থিক সুরক্ষার পরেও বড় ধরনের ঝুঁকি**

- **বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় (Catastrophic Expenditure):** ভারতের প্রায় ১৭% পরিবার এখনও আয়ের ১০%-এর বেশি চিকিৎসার পিছনে ব্যয় করতে বাধ্য হয়।
- **বৈষম্য:** সমীক্ষা বলছে, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে মানুষের খরচ কমলেও ক্যান্সার বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো জটিল চিকিৎসায় খরচ প্রায় **দ্বিগুণ** হয়েছে।
- **দারিদ্র্যের ফাঁদ:** চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় **৫৫ মিলিয়ন (৫.৫ কোটি)** মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে (বিশ্বব্যাংক)।

৫. **শহর-গ্রাম এবং লিঙ্গ বৈষম্য**

- **পরিকাঠামোর অভাব:** গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনীয় ৩৫,০০০টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের (CHC) বিপরীতে রয়েছে মাত্র ২৫,৭৪৩টি (RHS ২০২২-২৩)।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** চলাচলের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রথার কারণে মহিলারা সঠিক সময়ে চিকিৎসা পান না। এছাড়া স্ত্রী-রোগ বা মাতৃকালীন চিকিৎসার সুবিধাগুলো মূলত জেলা হাসপাতালকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ নারীরা পিছিয়ে থাকেন।

সরকারি উদ্যোগ: সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাঠামো নির্মাণ

- **আয়ুষ্মান ভারত PMJAY (২০১৮):** এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি অর্থায়িত স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। এর অধীনে ১২ কোটিরও বেশি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর (Secondary and Tertiary) চিকিৎসার জন্য বছরে পরিবার প্রতি **৫ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত স্বাস্থ্য কভারেজ দেওয়া হয়।

- **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAM):** উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে (PHCs) এই মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, রোগনির্ণয় এবং **টেলি-হেলথ** পরিষেবা সহ ব্যাপক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ২০২৪ সাল নাগাদ ১.৭২ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্র চালু হয়েছে।
- **PM-JAY-এর সম্প্রসারণ (২০২৪):** আয় নির্বিশেষে **৭০ বছরের বেশি বয়সী** সকল প্রবীণ নাগরিককে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে, যা বৃদ্ধ জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- **জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM):** গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাদান এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয়। এটি আশা (ASHA) কর্মী, এএনএম (ANM) এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- **PM আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন (PM-ABHIM):** ৬৪,১৮০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ব্লক, জেলা এবং মহানগর পর্যায়ে **ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিকাঠামো** তৈরি করা, যাতে অতিমারী মোকাবিলা এবং উচ্চতর চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলো প্রস্তুত থাকে।
- **প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিকল্পনা (PMBJP):** ১০,০০০-এর বেশি জনৌষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে **৫০-৯০% কম দামে** জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করা হয়, যা দীর্ঘস্থায়ী রোগীদের চিকিৎসার খরচ (OOPE) বহুগুণ কমিয়ে দেয়।
- **ই-সঞ্জীবনী (eSanjeevani) টেলিমেডিসিন:** এটি ভারতের জাতীয় টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ২০২৪ সাল পর্যন্ত **৩০ কোটির বেশি** মানুষ পরামর্শ নিয়েছেন। এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া সহজ করে তুলেছে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন: ভারতের জন্য শিক্ষণীয় পাঠ

- **থাইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল কভারেজ স্কিম (UCS):** থাইল্যান্ড তাদের সরকারি হাসপাতাল নেটওয়ার্কে প্রচুর বিনিয়োগ করে এবং চিকিৎসার খরচ নির্দিষ্ট করে দিয়ে প্রায় সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে। এর ফলে সেখানে মানুষের পকেট থেকে খরচ (OOPE) ১২%-এর নিচে নেমে এসেছে। ভারতও PMJAY **তালিকাভুক্ত হাসপাতালের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্য কাঠামো** গ্রহণ করতে পারে।
- **ব্রাজিলের সিস্তেমা ইউনিকো ডি সাউদে (SUS):** ব্রাজিলের এই ইউনিফাইড পাবলিক হেলথ সিস্টেমটি করের টাকায় চলে এবং শক্তিশালী প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করে। ভারতের **'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'** মূলত এই মডেলেরই প্রতিফলন।
- **রুয়ান্ডার কমিউনিটি-বেসড হেলথ ইন্স্যুরেন্স (CBHI):** রুয়ান্ডা স্বাস্থ্য বীমা এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে লাগিয়ে ৯০%-এর বেশি মানুষের কাছে বীমা সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। ভারতের **আশা (ASHA) নেটওয়ার্কের** ক্ষেত্রে এই মডেলটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ

ক. সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ

- ভারতে প্রতি ১,০০০ জন জনসংখ্যায় সরকারি শয্যার সংখ্যা ০.৫৫ থেকে বাড়িয়ে দ্রুত অন্তত **২টিতে** উন্নীত করতে হবে। বিশেষ করে **জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলোর** ওপর জোর দিতে হবে, যাতে তারা উন্নত চিকিৎসার (Tertiary Care) ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সঙ্গে যোগ্য প্রতিযোগিতা করতে পারে।
- PM-ABHIM প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জেলায় **'ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক'** তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। এটি জরুরি এবং বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনবে।

খ. PMJAY-এর রিইম্বারসমেন্ট সংস্কার এবং বেসরকারি হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ

- PMJAY-এর আওতায় চিকিৎসার প্যাকেজ মূল্য নিয়মিত সংশোধন করতে হবে যাতে তা চিকিৎসার প্রকৃত খরচের প্রতিফলন ঘটায়। তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলো যাতে রোগীদের কাছ থেকে ডায়াগনস্টিক বা আনুষঙ্গিক পরিষেবার জন্য আলাদা কোনো টাকা নিতে না পারে, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

- বিমা খাতের IRDAI-এর আদলে একটি নির্দিষ্ট **স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (Health Regulatory Authority)** গঠন করা প্রয়োজন, যা হাসপাতালের বিলিং, চিকিৎসার মান এবং রোগীদের অভিযোগ গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করবে।

গ. অসংক্রামক রোগ (NCD) ব্যবস্থাপনায় AAM নেটওয়ার্কে পর্যাপ্ত অর্থায়ন

- **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAM)** নেটওয়ার্কে অসংক্রামক রোগের (NCD) চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের সুবিধা প্রাথমিক স্তরেই নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রোগীদের ব্যয়বহুল হাসপাতালে ভর্তির হার কমানো যায়।
- তামিলনাড়ু মডেল অনুসরণ করে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে **অসংক্রামক রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে** সরবরাহ করলে দরিদ্র মানুষের পকেট থেকে খরচ (OOPE) নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে।

ঘ. দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী গড়ে তোলা

- ভারতে ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। **ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC)** কর্তৃক এমবিবিএস (MBBS) আসন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব মেটাতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট (PG) শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে প্রসারিত করতে হবে।
- হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে নিযুক্ত **কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (CHOs)** সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন করতে হবে, যাতে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রাথমিক চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন।

ঙ. জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় **জিডিপি-র ২.৫%-এ** উন্নীত করতে হবে এবং পরবর্তী ধাপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশকৃত ৫%-এর লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে হবে।
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যগুলোকে **জিএসটি (GST) ভাগাভাগিতে বিশেষ সুবিধা (Incentives)** দেওয়া যেতে পারে, যা রাজ্যস্তরে স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে।

চ. প্রযুক্তি এবং তথ্যের শক্তি ব্যবহার

- **আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন (ABDM)**-এর গতি বাড়াতে হবে। ইউনিক হেলথ আইডি এবং ডিজিটাল রেকর্ড তৈরির মাধ্যমে একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে এবং চিকিৎসায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।
- ৮০তম রাউন্ডের মতো সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যাদি (যেমন: পকেট থেকে খরচ বা রোগের ধরণ) রাজ্য স্তরের স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

- **ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (NSO)** পরিচালিত **৮০তম দফার পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা** স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ভারতে **বিমার আওতা বাড়লেও** পরিকাঠামো এবং সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আজও বড় ব্যবধান রয়ে গেছে।
- ভারতকে এখন সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিমা প্রকল্পের অধীনে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় পূর্ণ অর্থায়নে মনোনিবেশ করতে হবে। তবেই মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছে কেবল একটি 'সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা' নয়, বরং একটি **বাস্তব সত্যে** পরিণত হবে।

Q. India's healthcare challenge is no longer just about financial protection but about ensuring actual access to care. Discuss the key challenges in India's public health system and suggest measures to strengthen public sector hospital capacity. (15 Marks)

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. চরম তাপপ্রবাহ এবং গিগ ইকোনমি: ভারতের নগর শ্রম সহনশীলতার পুনর্ভাবনা

ভূমিকা

- গত এক দশকে ভারতে **তাপপ্রবাহের** (Heatwaves) পৌনঃপুনিকতা, তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। **ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ** (IMD)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চরম আবহাওয়া এখন অনেক বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এবং বছরের শুরুর দিকেই দেখা দিচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপপ্রবাহের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে।
- একই সময়ে, **জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল** (IPCC) সতর্ক করেছে যে, দক্ষিণ এশিয়া চরম **'ওয়েট-বাল্ব' তাপমাত্রার** (Wet-bulb temperatures)—যা তাপ এবং আর্দ্রতার এক বিপজ্জনক সংমিশ্রণ—সম্মুখীন হতে চলেছে। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে বা খোলা আকাশের নিচে কাজ করা অত্যন্ত অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।
- এই পরিস্থিতিতে, ভারত যখন আরও একটি প্রচণ্ড দাবদাহের গ্রীষ্মে প্রবেশ করছে, তখন ডেলিভারি এবং পরিবহন পরিষেবায় নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ **গিগ কর্মীদের** (Gig Workers) ক্রমবর্ধমান সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। প্রথাগত **শ্রম সুরক্ষা** (Labour Protection) ছাড়াই কাজ করা এই কর্মীদের অবস্থা বর্তমানে **জলবায়ু সহনশীলতা** (Climate Resilience), **শ্রম অধিকার** এবং **প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের** ক্ষেত্রে এক গুরুতর প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করছে।

পটভূমি: ভারতের গিগ কর্মীবাহিনী — একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

ক. গিগ কর্মী কারা?

- **"গিগ ইকোনমি"** (Gig Economy): এই শব্দটি এমন একটি শ্রমবাজারকে বোঝায় যা স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে **স্বল্পমেয়াদী চুক্তি, ফ্রিল্যান্স কাজ** এবং **অন-ডিম্যান্ড (চাহিদাভিত্তিক) টাস্ক** দ্বারা চিহ্নিত।
- **গিগ কর্মী: সামাজিক নিরাপত্তা বিধি, ২০২০** (Code on Social Security, 2020) অনুযায়ী, গিগ কর্মী হলেন "এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রথাগত নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের বাইরে কাজ করেন বা কোনো কর্মবিন্যাসে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই কার্যক্রম থেকে উপার্জন করেন।"
  - এর মধ্যে রয়েছেন **খাবার ও মুদি পণ্য সরবরাহকারী** (Delivery Agents), **ই-কমার্স কুরিয়ার, রাইড-হেইলিং চালক** (যেমন ওলা-উবার চালক), **লজিস্টিক হ্যান্ডলার** এবং **অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের** মাধ্যমে কর্মরত ফ্রিল্যান্স পেশাদাররা।
- **প্ল্যাটফর্ম কর্মী** (Platform Workers): এরা গিগ কর্মীদের একটি উপসেট, যারা নির্দিষ্টভাবে **অনলাইন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের** মাধ্যমে কাজে নিযুক্ত থাকেন।
- **অ্যাগ্রিগেটর** (Aggregators): এরা হলো ডিজিটাল মধ্যস্থতাকারী বা বাজার যা পরিষেবার ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে সংযুক্ত করে (যেমন: Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Urban Company)।

খ. সরকারি উদ্যোগ

- **রাজস্থান প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক গিগ কর্মী (নিবন্ধন ও কল্যাণ) আইন, ২০২৩:** রাজস্থান ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে গিগ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে, যেখানে একটি **কল্যাণ বোর্ড** গঠন এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন** নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্ণাটকও একই ধরনের আইনের প্রস্তাব করেছে।

গ. **ভারতে গিগ কর্মীবাহিনীর প্রবৃদ্ধি ও পরিধি**

- **নীতি আয়োগের ২০২২ সালের রিপোর্ট ('India's Booming Gig and Platform Economy') অনুযায়ী:**
  - ২০২০-২১ সালে ভারতে প্রায় **৭.৭ মিলিয়ন** গিগ কর্মী ছিল।
  - ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা **২৩ মিলিয়ন** ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় **১২ শতাংশ**।
  - আগামী দশকে অ-কৃষি কর্মীবাহিনীর **৬-৭ শতাংশই** হতে পারে গিগ কর্মী।
- **মোট কর্মীবাহিনীতে অংশ:** ২০২০-২১ সালে ভারতের মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ১.৫ শতাংশ ছিল গিগ কর্মী, যা ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে **৪.১ শতাংশে** পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
- **বর্তমান কর্মীবাহিনী: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ (Economic Survey 2025-26)** অনুসারে, ভারতের গিগ সেক্টরে কর্মীর সংখ্যা ২০২১ অর্থবর্ষের ৭.৭ মিলিয়ন থেকে ৫৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রায় **১২ মিলিয়নে** দাঁড়িয়েছে।
- **নগর কেন্দ্রিকতা:** গিগ কাজ মূলত **টায়ার-১ এবং টায়ার-২ শহরগুলোতে** (যেমন মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাই) ঘনীভূত, যেখানে প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক ডেলিভারি এবং রাইড-হেইলিং পরিষেবা সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

ভারতে গিগ কর্মীবাহিনীর গুরুত্ব

গিগ কর্মীরা, বিশেষ করে ডেলিভারি পার্টনার এবং পরিবহন চালকরা ভারতের নগর অর্থনীতির এক **অদৃশ্য মেরুদণ্ড (Invisible Backbone)** হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

১. **লাস্ট-মাইল জরুরি পরিষেবা নিশ্চিতকরণ:** তারা খাদ্য, ওষুধ এবং মুদি পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করে শহরের **ভোক্তা চক্রকে (Consumption Cycles)** সচল রাখে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় এই কর্মীবাহিনী একটি **সিস্টেমিক লাইফলাইন** হিসেবে কাজ করেছিল, যখন প্রথাগত ক্ষেত্রগুলো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা জরুরি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রেখেছিল।

২. **ডিজিটাল অর্থনীতির চালিকাশক্তি:** গিগ ইকোনমি হলো ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর এক দৃশ্যমান প্রতিফলন। **Swiggy, Zomato, Blinkit, Amazon, Flipkart, Ola, Uber, এবং Porter**-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো সম্মিলিতভাবে লক্ষ লক্ষ কর্মীকে সহায়তা প্রদান করে এবং বছরে কোটি কোটি লেনদেন সম্পন্ন করে। এটি একদিকে যেমন **পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)** সংগ্রহ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** আকর্ষণ করছে।

৩. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজন:** এই খাত ভারতের **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP)** প্রায় **১.২৫%** অবদান রাখে। লেনদেনের খরচ কমিয়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদানের মাধ্যমে গিগ কাজ মূলত **ই-কমার্স** এবং **কুইক কমার্স (Q-commerce)** শিল্পের দ্রুত প্রসারে জ্বালানি জোগাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) টিকিয়ে রাখতে একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল গিগ কর্মীবাহিনী অপরিহার্য।

৪. **কর্মসংস্থানের গণতন্ত্রীকরণ ও সুরক্ষা কবচ:**

- **সহজ প্রবেশাধিকার:** এটি প্রথম প্রজন্মের শহরমুখী অভিবাসী এবং নিম্ন আয়ের তরুণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ **জীবিকার সেতু (Livelihood Bridge)** হিসেবে কাজ করে, যাদের হয়তো প্রথাগত বা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা ডিগ্রি নেই।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:** গিগ প্ল্যাটফর্মের কাজের সময়ের নমনীয়তা এমন ব্যক্তিদের আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে যারা নির্দিষ্ট সময়ের চাকরিতে যুক্ত হতে পারেন না—এর মধ্যে রয়েছেন **প্রতিবন্ধী ব্যক্তি** বা যাদের ওপর পরিবারের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে।
- **লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় পথ:** ডেলিভারি কাজে পুরুষের আধিক্য থাকলেও, মহিলারা ডিজিটাল ফ্রিল্যান্সিং, ঘরোয়া মাইক্রো-টাস্ক এবং বিউটি ও ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্মে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন, যা সামগ্রিক **নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (FLFPR)** বৃদ্ধি করছে।

৫. **জলবায়ু ও সংকটকালীন বাফার:** চরম আবহাওয়ার সময়—যেমন তাপপ্রবাহ বা আকস্মিক বন্যা—গিগ কর্মীরা যাতায়াতের শারীরিক ঝুঁকি নিজেদের ওপর গ্রহণ করেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কতা মেনে ঘরে থাকতে পারেন এবং একই সাথে দেশের অর্থনীতিও স্থবির হয়ে পড়ে না।

৬. **মানব পুঁজির সঠিক ব্যবহার:** তাৎক্ষণিক উপার্জনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে গিগ ইকোনমি **অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব** (Involuntary Unemployment) রোধ করে। এটি কর্মীদের তাদের সময় এবং সম্পদ (যেমন দুই চাকার যানবাহন) কার্যকরভাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেয়, যা নগর শ্রমশক্তির সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তিতে অবদান রাখে।

চরম তাপপ্রবাহের সময় ভারতের গিগ কর্মীদের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার প্রভাব

১. **আয় বা উপার্জনের ওপর ধাক্কা:**

- চরম তাপপ্রবাহের সময় গিগ কর্মীরা সরাসরি **আর্থিক ধাক্কার** (Income Shock) সম্মুখীন হন, কারণ তাদের উপার্জন সম্পূর্ণভাবে কতগুলো ডেলিভারি সম্পন্ন হলো বা কতগুলো ট্রিপ নেওয়া হলো তার ওপর নির্ভর করে।
- বেতনভুক্ত কর্মচারীরা যেমন রিমোট ওয়ার্ক বা সপারিবারিক ছুটির সুবিধা পান, গিগ কর্মীদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাদের সামনে দুটি কঠিন বিকল্প থাকে: হয় কাজ বন্ধ করে **আয় হারানো**, অথবা শরীরের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া। এটি একটি অত্যন্ত **নিষ্ঠুর সমঝোতা** (Harsh Trade-off)।

২. **পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধির অভাব:**

- ভারতের বর্তমান শ্রম কাঠামোতে গিগ কর্মীদের জন্য তাপ-সংক্রান্ত কোনো **বাধ্যতামূলক বিরতি** (Rest Periods) নেই, কারণ তারা প্রথাগত নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের আওতার বাইরে।
- যদিও বিভিন্ন শহরে **হিট অ্যাকশন প্ল্যান** (Heat Action Plans) এবং অস্থায়ী জলছত্র বা কুলিং সেন্টার খোলা হয়েছে, কিন্তু এগুলো মূলত এক জায়গায় থাকা মানুষের জন্য তৈরি।
- একজন ডেলিভারি কর্মী যিনি দিনে ৩০-৪০টি ট্রিপ করেন, তার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো কুলিং সেন্টারে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা **জনসাধারণের পরিকাঠামোর** (Public Infrastructure) ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন, যা চরম গরমে প্রায়ই অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়।

৩. **অ্যালগরিদমিক চাপ এবং পারফরম্যান্স মেট্রিক্স:**

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো **অ্যালগরিদমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** ব্যবহার করে ডেলিভারির গতি এবং গ্রাহক রেটিং ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে। চরম তাপপ্রবাহের সময় এই মেট্রিক্সগুলো কর্মীদের ওপর এক ধরনের **পরোক্ষ চাপ** (Implicit Coercion) তৈরি করে।
- যদি কোনো কর্মী তাপজনিত ক্লান্তির কারণে কাজ ধীর গতিতে করেন বা লগ-অফ করেন, তবে তার রেটিং কমে যাওয়ার বা আইডি **ডিঅ্যাক্টিভেশনের** (Deactivation) ঝুঁকি থাকে। যেহেতু অ্যালগরিদম পরিবেশগত পরিস্থিতি বিবেচনা করে না, তাই এটি অনিরাপদ তাপেও কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

৪. **লিঙ্গ-নির্দিষ্ট সংবেদনশীলতা:**

- নারী গিগ কর্মীদের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চাপে। একদিকে চরম তাপের মধ্যে কাজ করা, অন্যদিকে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে গৃহস্থালির অবৈতনিক কাজ ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সামলানো। এই **দ্বিমুখী বোঝা** (Dual Burden) তাদের আয় ও কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।
- এছাড়া, অতিরিক্ত গরমে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে, যা তাদের কাজের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

৫. **সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:**

- গিগ কর্মীদের কল্যাণের দায়িত্বটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। স্বাস্থ্য দপ্তর শুধু চিকিৎসার দিকটি দেখে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ কেবল সংকটের সময় সাড়া দেয়, আর শ্রম দপ্তর অস্পষ্ট কর্মসংস্থান কাঠামোর কারণে সীমাবদ্ধ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোও জলবায়ু ঝুঁকি বাদ দিয়ে শুধু **দক্ষতার** (Efficiency) ওপর গুরুত্ব দেয়। ফলে একটি **সমন্বিত সাড়ার** (Coordinated Response) অভাব দেখা যায়।
- অধিকাংশ গিগ কর্মীর ESI **(কর্মচারী রাজ্য বিমা)**, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা নিয়োগকর্তার দেওয়া স্বাস্থ্য বিমা নেই। তাপজনিত অসুস্থতায় বা হাসপাতালে ভর্তি হলে কোনো **ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা** (Compensatory Mechanism) থাকে না।
- ২০২১ সালে চালু হওয়া **ই-শ্রম** (e-Shram) **পোর্টাল** বিপুল সংখ্যক কর্মীকে নথিভুক্ত করলেও, এটি এখনও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ও আয় সুরক্ষায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।

ভবিষ্যতের পথ: একটি জলবায়ু-সহনশীল গিগ ইকোনমি গঠন

১. **তাপ-সংবেদনশীল প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন:**

- **গতিশীল ইনসেন্টিভ:** চরম আবহাওয়ার সময় প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত **'হিট সারচার্জ'** (Heat Surcharges) চালু করা, যা সরাসরি কর্মীদের কাছে **'হ্যাজার্ড পে'** (Hazard Pay) বা ঝুঁকি-ভাতা হিসেবে পৌঁছাবে।
- **অ্যালগরিদম সমন্বয়:** যখন **'হিট ইনডেক্স'** (Heat Index) বা তাপ-সূচক নিরাপদ মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, তখন ডেলিভারির সময়সীমা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিথিল করতে হবে। এর ফলে ধীরগতির পরিষেবার জন্য কোনো জরিমানার ভয় থাকবে না।

২. **নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন:**

- **কুলিং হাব** (Cooling Hubs)**:** উচ্চ-ঘনত্বের ডেলিভারি জোনগুলোতে পৌরসভা ও অ্যাগ্রিগেটরদের যৌথ উদ্যোগে **'জলবায়ু সহনশীল বিশ্রামাগার'** (Climate Resilient Rest Areas) তৈরি করতে হবে, যেখানে পানীয় জল, পাখা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।
- **শীতলকরণের অধিকার** (Right to Cooling)**:** নীতিগতভাবে বাইরের বা খোলা আকাশের নিচে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য 'শীতল পরিবেশ পাওয়ার সুযোগ'-কে একটি মৌলিক শ্রম অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. **নীতিগত ও আইনি সংস্কার:**

- **বাধ্যতামূলক মানদণ্ড:** প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক আউটডোর কাজের জন্য নির্দিষ্ট এবং বাধ্যতামূলক তাপ-সুরক্ষা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে **'পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তাবলি (OSHWC) কোড'** আপডেট করতে হবে।
- **জলবায়ু-সংযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা:** গিগ কর্মীদের জন্য 'আবহাওয়া-জনিত ক্ষতিপূরণ' বা প্যারামেট্রিক বিমা প্রদান করতে ২০২০ সালের বিধি অনুযায়ী প্রস্তাবিত **'সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল'** (Social Security Fund) ব্যবহার করতে হবে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়:**

- **বিভাগীয় সমন্বয়:** কার্যকর তাপ ব্যবস্থাপনার জন্য **শ্রম মন্ত্রক, স্বাস্থ্য মন্ত্রক** এবং **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের** মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। তাপপ্রবাহকে কেবল স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি **'অর্থনৈতিক বিপর্যয়'** (Economic Disaster) হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি।

উপসংহার

ভারতের গিগ কর্মীরা তার নগর অর্থনীতির একইসাথে **সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সবচেয়ে অরক্ষিত** (Vulnerable) অংশ। তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে এই কর্মীবাহিনীর জন্য শ্রম সুরক্ষার অভাব মূলত **জলবায়ু অভিযোজনের** (Climate Adaptation) ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত ব্যর্থতাকে নির্দেশ করে, যা জরুরি ও সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপ দাবি করে।

এই কর্মীদের জন্য প্রকৃত সহনশীলতা মানে কেবল তাপজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করা নয়, বরং তাদের **জীবিকা রক্ষা করাও**। আর এর জন্য ভারতকে তাপপ্রবাহের প্রস্তুতিকে কেবল জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ হিসেবে নয়, বরং **'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের'** (Economic Justice) একটি ইস্যু হিসেবে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

Q. Discuss the significance of the gig economy in India's urban growth and analyse how climate change is altering its sustainability. Suggest a way forward. (15 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

Click here to watch this video